'আরণ্যক' : ভারতবর্ষ কোন দিকে

শিশিরকুমার দাশ

একমাত্র যদি নাও হয়, 'আরণ্যক' একটি প্রসিদ্ধ বাংলা উপন্যাস যার পটভূমিই শুধু বাইর্বাংলা নয়, যার অধিকাংশ চরিত্রই অ-বাঙালি। আর এই উপন্যাসের চরিত্রসংখ্যা বড় কম নয়। প্রকৃতি আর মানুষ এমনইভাবে এখানে পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো যে তাদের আলাদা করে দেখা কঠিন। আরও কঠিন হয়ে পড়ে যদি একটিকে বাস্তব আর অন্যটিকে নিতান্তই বানানো বলে মেনে নিতে হয়। কুশীনদীর অপর পারে এক দিগন্তবিস্তীর্ণ অরণ্য প্রান্তর আছে, বিভূতিভূষণ জানিয়েছেন যে সেই ভৌগোলিক স্থানটিই তাঁর আখ্যানের পটভূমি। পটভূমির বাস্তবতা বা 'সত্যতা' এবং আখ্যানের 'উপন্যাসত্ব' বিশেষভাবে ঘোষণা করার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমার মনে হয় তা নিহিত আছে আখ্যানের গঠনের মধ্যে এবং বিশেষ পরিমাণে আখ্যান-পরিকল্পনায়। স্থানিক বাস্তবতার প্রাধান্য যে ভ্রমণকাহিনীকে উপন্যাসের থেকে পৃথক করে চিনে নেওয়ার একটা উপায় সে বিষয়ে খুব সূক্ষ্ম তর্ক করার প্রয়োজন দেখি না। অন্তত বিভূতিভূষণ যখন 'আরণ্যক' রচনা করেছিলেন, সেই উত্তর-আধুনিকতাপূর্ব আখ্যান ও ইতিহাসের স্পষ্ট-বিভক্ত সীমাক্ষেত্রের অবিতর্কিত যুগে, তখনকার পাঠক-পাঠিকা উপন্যাস আর ডায়েরি ও ভ্রমণকাহিনীর পার্থক্য চিনে নিতেন সত্যমূলকতার ভিত্তিতে। বিভূতিভূষণ এমন একটা আখ্যান তৈরি করেছিলেন যার মানুষ এবং প্রকৃতি দুই-ই তাঁর পাঠক-পাঠিকা-সমাজের অভিজ্ঞতার বাইরে। এমনই অপরিচিত একটি পৃথিবী তাঁর কাহিনীর পটভূমি, যে তার অস্তিত্বের বাস্তবতা নিয়ে তিনি কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখতে চাননি। 'আরণ্যক' কাহিনীতে কোনো কোনো শহর ও জনপদের উল্লেখ আছে—তারা আমাদের ভৌগোলিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বলেই—তারা যে বাস্তব এ কথাটা আখ্যানকারকে বলে দিতে হয় না। বলে দিতে তখনই হয়, অথবা বলে দেবার প্রয়োজন তখনই হয়, যখন তাদের অস্তিত্ব বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও তারা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, অর্থাৎ অপরিচিত। 'আরণ্যক'-এর অপরিচিত পটভূমির সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি পটভূমি কাহিনীতে ধরা দেয় না ঠিকই, কিন্তু 'আরণ্যক'-এর আরণ্য পটভূমির সমস্ত মহিমা, সমস্ত সৌন্দর্য, সেই প্রচ্ছন্ন পটভূমির বৈপরীত্যে। লেখককে তাই ঘোষণা করে দিতে হয় যে এই প্রচ্ছন্ন পটভূমিটি যেমন বাস্তব, যেমন ভৌগোলিক সত্য, তেমনই বাস্তব, তেমনই ভৌগোলিক সত্য 'আরণ্যক'-এর পটভূমি।

'আরণ্যক'-এর আখ্যান যেমনই উন্মোচিত হতে থাকে, তেমনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এর

Scanned with CamScanner

আখ্যানের অন্তর্বর্তী দুটি বিরোধী স্রোত। আর সেই বিরোধিতার পূর্বসংকেত এর কাহিনী-চরিত্র বিষয়ে লেখকের মন্তব্য। শুধু অপরিচিত আরণ্যপ্রকৃতির কুশল চিত্রণের জন্যই যে কোনো অসতর্ক পাঠক-পাঠিকা একে ভ্রমণকাহিনী বলে ভুল করতে পারেন তা নয়, এর মধ্যে বার বার আছে আরণ্যসমাজের নানা খুঁটিনাটির বর্ণনা, নানা তথ্যের সমাহার, যেসব তথ্য এক সমাজবিজ্ঞানী সাগ্রহে সংগ্রহ করে থাকেন। সেই তথ্যগুলি যে বানানো, 'উপন্যাস' মাত্র, এমন কথা লেখক বলেননি। তাদের বাস্তবতা বা তথ্যমূল্য নেই এমন সন্দেহ পাঠক-পাঠিকার মনে ওঠার সম্ভাবনা নেই। বরং মনে হয়, সেইসব তথ্য আখ্যানের মধ্যে একটা বিশেষ প্রয়োজনেই নিজের জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। অর্থাৎ শুধু প্রকৃতি নয়, মানবসমাজেরও একটা বাস্তব ভিত্তি আছে—যেমন সব আখ্যানেই থাকে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে যা আছে তা এক বিপরীতের দ্বন্দ্ব। প্রকৃতির বৈপরীত্য এবং মানবসমাজের বৈপরীত্য। আর এই বিপরীতের দ্বন্দ্বই এর আখ্যান নির্মাণের অন্যতম প্রধান কৌশল।

২

বৈপরীত্যের সূচনা করেন আখ্যানের কথক স্বয়ং। কথকের একটা নাম আছে : 'সত্যচরণ'। কিন্তু দেখা যাবে, শহর থেকে অরণ্যে স্থান-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিনামটার ব্যবহার আর হয় না। অসংখ্য আরণ্য চরিত্রগুলির মধ্যে সে এমনই স্বতন্ত্র যে তার পরিচিতির জন্য নাম অবান্তর। অশিক্ষিত, বিহারী চরিত্রগুলির মধ্যে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তা উদ্‌ভাসিত হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিনামে। এই কথক একজন শিক্ষিত বাঙালি। সে আরণ্য জগতে এক বহিরাগত ; শুধু বহিরাগত নয়, সে এই জগতের প্রতি বিরক্ত, অপ্রসন্ন। তার সঙ্গে সঙ্গে আরণ্য পটভূমির মধ্যে প্রবেশ করে আর একটি ভূগোল—নাগরিক ভূগোল। সেই ভূগোল শুধুমাত্র কথকের। সেই ভূগোল কলকাতা।

কাহিনীর সূচনা এবং উপসংহারে কথকের ভৌগোলিক অবস্থিতি কলকাতায়। আর এই অবস্থান আখ্যানের গঠনে এক তাৎপর্যপূর্ণ কৌশল। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে কলকাতার উপস্থিতি অন্তঃশীল, এবং এই আরণ্যপ্রকৃতির প্রতিবাদী। কথক মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত (অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষিত) শহরের মানুষ ; সংস্কৃতির অভিমান তার প্রবল, সভ্য মানুষের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট ('বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, লাইব্রেরি, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা') এবং সেইসঙ্গে অশিক্ষিত অসংস্কৃত বিহারীদের প্রতি তার অপার অবজ্ঞা।[১] এই

---

১ ভারতবর্ষের প্রত্যেক অঞ্চলের লোক নিজ নিজ অঞ্চলের বা নিজ ভাষাগোষ্ঠীর বাইরের লোকদের কতকগুলি স্থাণু ভাবমূর্তি রচনা করেছে। নানা সামাজিক, রাজনৈতিক কারণে এই মূর্তিগুলি গড়ে উঠেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই মূর্তিগুলি সেই অঞ্চলের বা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের পক্ষে সম্মানজনক নয়। ধীরে ধীরে এই মূর্তিগুলি জীবন থেকে সাহিত্যেও প্রবেশ করেছে। তামিল সাহিত্যে অ-তামিলভাষী কিংবা উত্তর-ভারতীয়দের, পাঞ্জাবি সাহিত্যে অ-পাঞ্জাবিদের, মারাঠি সাহিত্যে অ-মারাঠিদের কিংবা বাংলা সাহিত্যে অ-বাঙালিদের এইরকম স্থাণু মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালির চোখে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সব ভাষাগোষ্ঠীর স্থাণু মূর্তি এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু বিশেষভাবে যে দুটি অঞ্চলের মানুষের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির অবজ্ঞা, অনুকম্পা ও নির্দয়তার মধ্য থেকে এই স্থাণু মূর্তি গড়ে উঠেছে সে দুটি অঞ্চল হল ওড়িশা

Scanned with CamScanner

কথকের কাজ এক বিস্তীর্ণ আরণ্য অঞ্চলে জমি বিলিবন্দোবস্ত করা। অরণ্যের উচ্ছেদ করে বসতি স্থাপন করা। এই কাজে বাঙালি কথকটি অবশ্য যন্ত্র মাত্র। সে ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীদের কর্মচারী মাত্র। তার চারপাশের প্রকৃতি তার নিজস্ব এবং পরিচিত প্রকৃতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ভিন্নতার জন্যই সে প্রথম থেকে এই অরণ্যের মধ্যে এক প্রতিকূল অধিবাসী। কিন্তু তার প্রাথমিক প্রতিকূলতা যতটা না প্রকৃতির বিরুদ্ধে, তার চেয়ে বেশি মানুষের বিরুদ্ধে।

> ...নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া, যে কয়খানি বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা পড়িয়াই কোনো রকমে দিন কাটাই। কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্বর, না বোঝে তাহারা আমার কথা, না আমি ভালো বুঝি তাহাদের কথা।

প্রকৃতির চেয়েও, কথক অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন তার পরিচিত সংস্কৃতি থেকে। এই সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যোগ 'বই'—ভাষা। এই ভাষা তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এই 'নিতান্ত বর্বর' সমাজ থেকে।

> মানুষ এখানে থাকে? লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—একটা কথা কহিবার মানুষ পর্যন্ত নাই। এদেশের এইসব মূর্খ, বর্বর মানুষ, এরা একটা ভালো কথা বলিলে বুঝিতে পারে না-এদেরই সাহচর্যে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে?

বার বার 'মানুষ' শব্দটি উচ্চারণ করে কথক, আর বার বার 'মানুষ' শব্দটির উচ্চারণ করে কথক এই অঞ্চলের মানুষের সহজাত মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করতে চায়। তারা মূর্খ, বর্বর। সমস্ত পৃথিবীটা ভাগ হয়ে যায় সভ্যে আর অ-সভ্যে। এই আরণ্য অঞ্চল আর তার মানুষ মূর্খ, বর্বর, অ-সভ্য। আর সভ্যজগৎ দূরে, সেখানেই 'মানুষ'-এর ভিড়।

> ...সংকল্প করিলাম...চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সভ্য বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সংগীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

এই সভ্য জগৎ-ই 'মানুষ'-এর জগৎ, শুধু এখানেই 'মানুষের ভিড়', এখানেই "মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর"। কলকাতা এই সভ্য জগতের অন্তর্গত। এই কলকাতাই কথকের সাংস্কৃতিক পটভূমি।

আবার বলা দরকার যে কাহিনীর শুরুতে পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গলমহাল এবং কলকাতা শহরের ভৌগোলিক পরিবেশের স্পষ্ট উচ্চারিত বৈপরীত্যের সঙ্গে, অনুচ্চারিত (?) আছে শিক্ষিত বাঙালি ও অশিক্ষিত বিহারীর বৈপরীত্য ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের

এবং বিহার। বাংলা সাহিত্যে মারাঠি, পাঞ্জাবি, রাজস্থানী, গুজরাতি, ওড়িয়া, বিহারী ইত্যাদি চরিত্রের রূপায়ণ সম্বন্ধে সাধারণ পরিচয়ই যাঁর আছে তিনি উপলব্ধি করবেন যে এই স্থাণু মূর্তিগুলির গঠনের জন্য দায়ী অগভীর অভিজ্ঞতা এবং 'অন্য'-কে বোঝার সহানুভূতির অভাব। গত শতাব্দী থেকে বাঙালির লেখায় (এবং প্রাত্যহিক আচরণে) বিশেষভাবে ধিককৃত এবং নিন্দিত হয়েছেন বিহারী এবং ওড়িয়া। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অ-বাঙালি সাহিত্যে বাঙালির যে স্থাণু মূর্তি গড়ে উঠেছে তা হল বুদ্ধিমান কিন্তু ধূর্ত, সংস্কৃতিবিলাসী এবং স্বার্থপর মানুষ। 'আরণ্যক' আখ্যানের মধ্যে বাঙালি-অবাঙালি (বিশেষ করে বাঙালি-বিহারী) স্থাণুমূর্তির সংঘাত অত্যন্ত তীব্র এবং স্পষ্ট।

Scanned with CamScanner

ইতিহাস। এই বৈপরীত্য, এই সংঘাত, এই বিরোধিতা ও দ্বন্দ্বের একটা দীর্ঘ বেদনাদায়ক ইতিহাস আছে, যা অনেকেরই জানা। 'আরণ্যক' এই ইতিহাসের থেকেই উদ্ভূত, যদিও এর আখ্যান থেমে নেই বাঙালি-বিহারীর বিরোধিতার মধ্যে, বরং তা বিস্তারিত হয়েছে আরও বৃহৎ সংঘর্ষের ইতিহাসে, আরও বৃহত্তর ভিন্ন টানাপোড়েনে। এ কাহিনীর কথক অবশ্যই প্রতিকূল কথক থেকে ধীরে ধীরে এক সহানুভূতিশীল কথকে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তার শিক্ষিত, নাগরিক সত্তা শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থেকেছে। কথকের 'মানুষ' সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ শহরকেন্দ্রিক। "পূর্বে কি জানিতাম মানুষের মধ্যে থাকিতে এত ভালোবাসি!" এই মানুষ শহরের মানুষ। এই অঞ্চলের মানুষ কথকের 'মানুষ'-এর ধারণার বাইরে। এই 'মানুষ'-দের সঙ্গে কথকের পরিচয় শুধু যে একটা বিরোধী সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যেই তা নয়, বৃত্তিগত দিক থেকে শক্তির বৈষম্যদ্বারাও শাসিত। কথক 'শক্তিশালী', এ অঞ্চলের মানুষ কথকের শক্তির দ্বারা শাসিত। তাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের না হলেও সম্পূর্ণ অসম।

আবার এই অসম সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই এই মানুষগুলির সঙ্গে কথকের জীবনে প্রথম সহানুভূতিশীল মুহূর্তের উদয় হয়। সেই অর্থে সিপাহি মুনেশ্বর সিং-কে কথকের কড়া কিনে দেবার ঘটনাটি বিশেষ মূল্যবান। এই অপরিচিত জগৎ যে কত অপরিচিত, এবং নাগরিক ও আরণ্য জগতের বৈষম্য ও ব্যবধান যে কী বিশাল তার বোধ কথক অর্জন করে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে। "শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরিব। এত গরিব তাহা জানিতাম না।" সামান্য একটি কড়া, তার জন্য এত কৃতজ্ঞতা, এত আনন্দ। ... "সর্বপ্রথম আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলো। বড় কষ্ট তো এদের!"

কথকের সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ 'মানুষ'-এর সংসারে এই প্রথম 'লোক'গুলি একটি স্থান অর্জন করে।

৩

মানুষের মতোই প্রকৃতিও অপরিচিত। "বাংলাদেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছি"—কথকের এই উক্তিটি তার সঙ্গে এই আরণ্যপ্রকৃতির সম্পর্ক রচনায় কেন্দ্রীয় সূত্র। ইংরেজ ঔপন্যাসিকেরা যাঁরা ভারতীয় জীবনের কাহিনী লিখেছেন তাঁদের রচনায় ভারতীয় প্রকৃতি প্রকটিত হয়েছে একটা অপরিচয়ের রহস্য নিয়ে। এই অপরিচয় অস্বাভাবিক নয় ঠিকই, কিন্তু এই অপরিচয়ের মধ্যে আছে একটা দুর্জ্ঞেয়তা, একটা প্রতিকূল বিরোধী শক্তি। মানুষের মতোই এই প্রকৃতিও 'অন্য', 'আমি' থেকে স্বতন্ত্র। বাংলা কথাসাহিত্যে নাগরিক ও পল্লী-প্রকৃতির বৈপরীত্য বার বার উচ্চারিত হয়েছে। বহুবারই এই পল্লী-প্রকৃতির গৌরবায়ণ করেছেন লেখকেরা। পল্লী-প্রকৃতিকে নগর-প্রকৃতির প্রতিষেধক হিশেবে দেখেছেন লেখকেরা। কিন্তু 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি শুধু নগর কলকাতা থেকে ভিন্ন নয়, তা বাংলাদেশের প্রকৃতির থেকেও ভিন্ন। সেই ভিন্নতার ফলেই কথকের পক্ষে তা আরও অস্বস্তিকর। "...এই অরণ্যভূমির নির্জনতা

Scanned with CamScanner

যেন পাথরের মতো বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।"

এই প্রকৃতির লক্ষণ 'নির্জনতা'। এখানে অরণ্য ও বসতির বিরোধ, নির্জনতা ও জনতার বিরোধ। কথক যে-সংসারের অধিবাসী তা মূলত নির্জনতা-বিরোধী। কথকের প্রধান কাজ এই নির্জনতা হনন এবং মানুষের সংসার স্থাপন। কাছারি ঘর থেকে কিছু দূর গেলেই কথকের "...মনে হয় সমস্ত পৃথিবীতে আমি একাকী"। কিংবা "যত দূর চোখ যায়, এ সব যেন আমার, আমি এখানে একমাত্র মানুষ....।" অথবা "আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া অন্ধকার বন ও প্রান্তর, মাথার উপর নক্ষত্র-ছড়ানো দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ। আমার বড় অদ্ভুত লাগিল, যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।" এই পৃথিবী 'অদ্ভুত', 'অজ্ঞাত', 'রহস্যময়'। এই পৃথিবী 'চিরপরিচিত' পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র। এখানে বসবাস, যথার্থই বনবাস, 'নির্বাসন'। শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও বর্বর।

আখ্যানের একটি স্রোত যদি হয় এই 'বর্বর' অন্যভাষী মানুষের সঙ্গে কথকের ক্রম-পরিচয়, আরেকটি স্রোত এই অপরিচিত রহস্যময় প্রকৃতির সঙ্গেও ক্রম-পরিচয়। শুধু একটি পার্থক্য আছে দুই স্রোতের মধ্যে। মানুষের সঙ্গে এখানে কথকের ভূমিকা আধিপত্যের ; কথক আর্থিক শক্তিতে অন্যদের চেয়ে শক্তিমত্তর, তার প্রাধান্য প্রতিবাদরহিত, তার কাছে আরণ্য মানুষের প্রসাদ ভিক্ষা। কাহিনীর শেষ পর্যন্ত কথক তাই তার নাগরসত্তার গর্ববোধেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যে পরিচয় সেখানে তার ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, ক্রমশই প্রকৃতির কাছে হারমানা। "...আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়ে, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।" এই প্রথম আখ্যানের মধ্যে কলিকাতার সমালোচনা। প্রকৃতি কি তা হলে জয় করেছে কথককে? "ফিরিতে পারিব না"--- এই বোধ কি প্রকৃতির কাছে কথকের আত্মসমর্পণের স্বীকারোক্তি?

কিন্তু প্রকৃতি ও মানুষ দুজনের প্রতি কথকের আকর্ষণ : মানুষের প্রতি আকর্ষণে কথকের অবস্থান একটি উচ্চতর তলে, যেখান থেকে সে এই মানুষগুলিকে অবজ্ঞা করতে পারে আবার সহানুভূতিশীলও হতে পারে ; প্রকৃতির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক সেখানে তার অবস্থান নিম্নতর তলে ; প্রকৃতিই শক্তিময়ী। কিন্তু এই শক্তির উৎস রহস্যময়। একটা প্রতিরোধ চলে সেখানে, কথক যার বিরুদ্ধে কীভাবে আত্মরক্ষা করবে জানে না। "...অন্নভোজনলোলুপ সরল ব্যক্তিগুলিকে আমার সে-রাত্রে এত ভালো লাগিল!" উচ্চতরতল থেকে কথকের এই স্নেহদৃষ্টি। আর অন্যদিকে দেখি, প্রকৃতির সামনে কথকই পরিণত হয়েছে এক সরল না হলেও মুগ্ধ ও অনভ্যস্ত পুরুষে। প্রকৃতি এক নারী। সেই নারী ধীরে ধীরে তাকে জয় করছে। "কত রূপে কত সাজেই যে বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ ও অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল!" এ কি তার

Scanned with CamScanner

৬

হননকারীর বিরুদ্ধে অরণ্যের রহস্যময় সংগ্রাম?

৪

অসংখ্য চরিত্র 'আরণ্যক' উপন্যাসে। নারী পুরুষ বালক ; সৎ ধূর্ত গরিব ধনী ; কবি ভক্ত শিল্পী। কেউই কোনো ঐতিহাসিক নরনারী নয়, সবাই এক বানানো কাহিনীর কুশীলব। কিন্তু এই মানুষগুলির স্থানিক এবং সামাজিক পরিচয় পরিস্ফুট করার জন্য কথক পাঠক-পাঠিকার সামনে ক্রমাগত উপস্থিত করতে থাকে নানা সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক তথ্য। প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় এই মানুষগুলি ভিন্ন, প্রত্যেক মুহূর্তেই তুলনা এসে পড়ে বাঙালি জীবনের। এবং আমরাও বুঝতে পারি যে এর আখ্যান অবশ্যই 'উপন্যাস', কিন্তু এই উপন্যাসের জগৎ 'কল্পলোক' নয়। এখানে আছে দুটো দেশের বৈপরীত্যের কাহিনী : এ দেশ ও নিজের দেশ ("এদেশের গৃহস্থ-সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিলাম না")। এদেশের গৃহস্থ সংসারের খুঁটিনাটি সংগ্রহ করে কথক। এদেশ অপরিচিত :

> তাহার পর দশ-এগারো বছরের একটি ছোট মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা থালা ধরিল—থালায় গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটা মধুপর্কের মতো ছোট বাটিতে সামান্য একটু আতর, কয়েকটি শুষ্ক খেজুর ; ইহা লইয়া কী করিতে হয় আমার জানা নাই...
>
> প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা— সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতির কানের মতো পুরি, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া। খাবার জিনিশের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ কখনও দেখি নাই।
>
> পাত্রের অভাবে ময়লা থান কাপড়ের প্রান্তেই ছাতুটা মাখিতেছে — এত বড় একটা তাল যে, একজন লোকে — হলই বা হিন্দুস্থানী, মানুষ তো বটে—কী করিয়া অত ছাতু খাইতে পারে এ আমার বুদ্ধির অগোচর।
>
> হঠাৎ মেয়েমানুষের গলায় আর্তকান্নার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ...ব্যাপার কী? কেহ কি হঠাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল?... এদেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ।
>
> মুক্তিনাথ সিং জিজ্ঞাসা করিল, কোন নাচ তাহারা দেখাইতে পারে। দলের মধ্যে একজন ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সেলাম করিয়া বিনীতভাবে বলিল—হুজুর, হো হো

নাচ আর ছক্কর-বাজি নাচ। ...বেলা পড়িবার সময় তাহারা আসিয়াছিল, ক্রমে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিল, তখনও তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত ধরিয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে। অদ্ভুত ধরণের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের গান।

এদেশে পয়সা জিনিশটা বাংলা দেশের মতো শস্তা নয়, এখানে আসিয়া পর্যন্ত তা দেখিতেছি। শুকনো কাশ ও সাবাই ঘাসের ছোট্ট একটা ছাউনি কেঁদ ও আমলকীর বনে, সেখানে বড় একটা মাটির হাঁড়িতে মকাই সিদ্ধ করিয়া কাঁচা শালপাতায় সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছে...

কুণ্ডির চারিধারে কাদার উপর আট-দশটা ছোট-বড় সাপ, অন্য দিকে তিনটি প্রকাণ্ড মহিষ একসঙ্গে জল খাইতেছে।.... মহিষ দেখিয়া মনে হইল এ ধরণের মহিষ আর কখনও দেখি নাই। প্রকাণ্ড একজোড়া শিং, গায়ে লম্বা লোম—বিপুল শরীর।

উদাহরণ বাড়ানো যায়, কিন্তু সম্ভবত তার প্রয়োজন নেই। আরণ্য মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, ধর্মবিশ্বাস-উৎসব-কুসংস্কার, আরণ্য অঞ্চলের পশু-পাখি-সরীসৃপ সমস্ত কিছুর মধ্যে কথক দেখে এক 'ভিন্নতা'। কথক এইরকম তথ্য সংগ্রহ করে, আর সেই তথ্যের ঘন বুনটের মধ্য দিয়ে 'উপন্যাস'কে প্রতিষ্ঠিত করে। পাঠক-পাঠিকার বুঝতে সামান্য মাত্র অসুবিধা হয় না যে শুধু বহিঃপ্রকৃতি মাত্র নয়, এখানকার মানবসমাজও একটা কল্পিত সমাজ নয়। কল্পিত শুধু এই আখ্যান। এই তথ্যগুলি নৃতাত্ত্বিকের 'নিরপেক্ষ' তথ্য নয়, কথকের 'ভিন্নতা'-র বোধে নিষিক্ত। প্রত্যেক মুহূর্তে এই তথ্য বর্ণনার পেছনে ক্রিয়াশীল একটা নাগরিক মন। কথক এসেছে শহর থেকে, শহরের সভ্যতার অভিমান নিয়ে, আরণ্য মানুষের ওপর আধিপত্যের বোধ নিয়ে। শহর থেকে সে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এখানেও সে শহরের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। শুধু শাহরিক শিক্ষা ও সংস্কারের দ্বারাই নয়, শহরই এই অরণ্যপ্রকৃতির নিয়ামক। কথকের কাজ তার মালিকের নির্দেশপালন। মালিকের নির্দেশ শহরেরই নির্দেশ। "ডাক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একরাশি কাজ আসিয়া পড়ে। শহরের নানা ধরণের চিঠি, নানা ধরণের আদেশ....।" তা ছাড়া যতই লড়াই চলুক কথকের সঙ্গে অরণ্যপ্রকৃতির, শহরের প্রতি আকর্ষণ ছিন্ন হয় না। ডাক আসে শহরের আহ্বান নিয়ে। "একখানা বিলাতি ম্যাগাজিনের গ্রাহক হইয়াছি, আজ সেখানা আসিয়াছে। মোড়কের উপরে লেখা 'উড়ো জাহাজের ডাকে।"

৫

'আরণ্যক' উপন্যাসটি যাঁরা মানুষ ও প্রকৃতির এক তীব্র আকর্ষণের কাহিনী হিশেবে পাঠ করতে অভ্যস্ত তাঁরা এই পাঠে বিরক্ত হবেন। কিন্তু এই কথক এবং এখানকার মানুষগুলির সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ভিন্নতাকে অস্বীকার না করলে এই আখ্যানকে একটি নিছক প্রকৃতিপ্রীতি এবং আধুনিক সভ্যতা-কর্তৃক অরণ্যভূমির নিধনের বেদনাদায়ক

Scanned with CamScanner

কাব্য হিশেবে গ্রহণ করা কঠিন। এখানকার প্রকৃতি এবং মানুষ একদিকে একটা জগৎ তৈরি করেছে, অন্য দিকে কথক এবং কথকের পরিচিত ভূগোল আর একটা জগৎ তৈরি করেছে। সিপাহি মুনেশ্বর সিং, গনোরী তেওয়ারী, গনু মাহাতো, নন্দলাল ওঝা, জওয়াহিরলাল সিং, রামধনিয়া টহলদার, ধাওতাল সাহু, জয়পাল কুমার, কুন্তা, দশরথ, ধাতুরিয়া, রাজু পাঁড়ে, যুগলপ্রসাদ—আরও আরও অনেক চরিত্রের সমাবেশ এই আখ্যানে। তাদের জীবন, আচরণ, তাদের চিন্তা-কর্ম সবই পাঠকপাঠিকাকে এক ভিন্ন জগতের স্বাদ এনে দেয়। এই মানুষগুলি প্রত্যেকে অ-বাঙালি এবং এদের অ-বাঙালিত্ব প্রতিমুহূর্তে কথকের চোখে স্পষ্ট। কথকও আখ্যানের মধ্যে মধ্যে বার বার তার বাঙালিত্ব এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে তার যে যোগ তা মনে করিয়ে দেয়। "প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে এক-এক সময়, বাংলা দেশ ভুলিয়া গিয়াছি, কত কাল দুর্গোৎসব দেখি নাই, চড়কের ঢাক শুনি নাই", এমনকী "বৈশাখী প্রভাতে পাখির কলকূজন উপভোগ করি নাই"। শুধু বাংলার পরিচিত প্রকৃতি নয়, পরিচিত গার্হস্থ্য জীবন তার স্মৃতিকে উদ্বেলিত করে—"বাংলার গৃহস্থালির যে শান্ত পূত ঘরকন্না জলচৌকিতে পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র, পিঁড়িতে আলপনা, কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর কড়ির চুপড়ি..."। এই টানাপোড়েনকে বাদ দিয়ে 'আরণ্যক'কে মানব ও প্রকৃতির সম্পর্কের কাহিনী হিশেবে দেখা একটা অসম্পূর্ণ পাঠ। প্রকৃতির প্রতি কথকের যে সাড়া এই আখ্যানে তা বিভূতিভূষণের অন্যান্য আখ্যানে (যেমন : 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'ইছামতী') মানুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ এবং প্রকৃতির প্রতি সাড়া থেকে তাই বিশেষভাবে পৃথক।

আগেই বলেছি এই আখ্যানের কথক শুরুতে ছিল এক প্রতিকূল-কথক। ধীরে ধীরে সে পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তন সম্পূর্ণ হবার আগেই কথক ফিরে গেছে তার নিজস্ব পরিবেশে, কলকাতায়, বাংলাদেশে, সভ্যতার মধ্যে। আখ্যান সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। বাঙালি এবং অবাঙালি, সভ্য এবং অসভ্য, নাগর ও আরণ্য এই দ্বৈততার মধ্যে কাহিনী শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে দুই সভ্যতার সংঘাতে। কিন্তু সেখানেও কাহিনী শেষ হয়নি। আখ্যানের এই অংশটিকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যাক।

'আরণ্যক' আখ্যানের তুঙ্গ কথকের সঙ্গে সাঁওতালরাজ দোবরু পান্নার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতায়। দোবরু পান্না সাঁওতালরাজ। তাঁর "রাজধানী খুব ছোট, কুড়িপঁচিশ ঘর লোকের বাস।"

দোবরু পান্নার কাহিনী মূল আখ্যানে প্রবেশ করার সময় লেখককে একটি কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। এইখানে আর-একজন কথকের আবির্ভাব হয়েছে। সেই কথক বা উপকথক বুদ্ধু সিং। বুদ্ধু সিং স্থানীয় লোক, এই অঞ্চলের ইতিহাস তার জানা। সে বলে, আর মূল কথক এবার বদলে যায় কৌতূহলী শ্রোতায়। কথক বুদ্ধু সিং বলে, এই অঞ্চলে একদিন ছিল "অসভ্য বুনোজাতির রাজ্য"। সেই বুনো জাতি মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে। "১৮৬২ সালের সাঁওতাল-বিদ্রোহের পর" তাদের সমস্ত রাজ্য যায়, প্রতিপত্তি যায়। কিন্তু এখনও আছে কিছু স্মৃতি, কিছু অবশেষ—"খুব বৃদ্ধ আর খুব

Scanned with CamScanner

গরিব" রাজা, "সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা" দোবরু পান্না।

কথক বুদ্ধু সিং-এর আখ্যান 'আরণ্যক' কাহিনীর মধ্যে একটা নূতন মাত্রা আনে। এতক্ষণ কাহিনী ছিল শুধু বর্তমানকালের, চরিত্রগুলি ছিল অরণ্যের 'অসভ্য' মানুষ। বুদ্ধু সিং-এর আখ্যান এক প্রাচীন জাতির প্রতিপত্তি ও সম্মানের উত্থানপতনের কাহিনী। বুদ্ধু সিং ব্যক্তিগতভাবে এই আখ্যানের এক নিরপেক্ষ এবং নিরাসক্ত কথক মাত্র। সেও বর্তমান কালেরই প্রতিনিধি। সভ্য জগৎ যে দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে সে তা জানে এবং আরও জানে যে তার অবশিষ্ট সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হবার শেষ দিন বেশি দূর নয়। সে যেমন নিরাসক্তভাবে মূল কথককে দোবরু পান্নার ইতিহাস শোনায়, তেমনই আবার মূল কথকের সম্ভাব্য মানসিকতার অনুকূলতা করতেই চায়। "খুব বৃদ্ধ খুব গরিব" দোবরু পান্না, কিন্তু বুদ্ধু সিং জানায় যে "...এ দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।" বুদ্ধু সিং মূলকথকের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া অনুমান করেই এই রাজ্যহীন রাজার বিরোধাভাস কৌশল হিশেবে ব্যবহার করে। এমনকী মূলকথকের সঙ্গে রাজার পরিচয় হওয়ায় তার কোনো উৎসাহ নেই, বরং সে সতর্কভাবেই বিরোধিতা করে। "পাহাড়ি অসভ্য জাতের রাজা, তাই বলে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলার যোগ্য বাবুজি?" এই সঙ্গে লক্ষণীয় যে দোবরু পান্নার সঙ্গে কথকের আনুষ্ঠানিক পরিচয় সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী থেকে বুদ্ধু সিং-কথকের প্রস্থান। কিছু কালের জন্য মূল কথকের শ্রোতায় পরিবর্তন এবং নুতন কথকের আবির্ভাব বিশেষভাবে স্মরণীয়।

'আরণ্যক'-এর মূল কথক এবার নিজস্ব ঐতিহাসিক অবস্থান থেকেই প্রাচীন বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে দোবরু পান্নার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের আগে থেকেই কথকের চিন্তায় সভ্যতা সম্পর্কে একটি বিশেষ জিজ্ঞাসা ছিল। "বুঝি না কেন এক-এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কী বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যত দিন যায় তত উন্নতি করে—আবার অন্যজাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই একস্থানে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে?" এই জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর কথক দেননি। কিন্তু জানেন যে আর্যজাতি, "বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চরক-সুশ্রুত লিখিল, দেশ জয় করিল, সাম্রাজ্য পত্তন করিল"— এই যে আর্যজাতি তা শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়, কথক আর্যজাতির গৌরবময় ইতিহাসের কথা বলে চলেন—"ভেনাস দ্য মিলোর মূর্তি, পার্থেনন, তাজমহল, কোলোঁ ক্যাথিড্রাল গড়িল, দরবাড়ী (দরবারি) কানাড়া ও ফিফ্‌থ সিম্‌ফোনির সৃষ্টি করিল—এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ি, বেতার, বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিল।" অথচ "পাপুয়া, নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা, আমাদের দেশের ওই মুন্ডা, কোল, নাগা, কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর?"

কথকের এই জিজ্ঞাসার উদ্রেক করেছিল এক অতি বৃদ্ধা—"তাহার বয়স আশি-নব্বুই হইবে, শণের-নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতেছে...এ অঞ্চলের বন্য সভ্যতার প্রতীক

Scanned with CamScanner

ওই প্রাচীন বৃদ্ধা—পূর্বপুরুষেরা এই বনজঙ্গলে বহু সহস্র বছর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। যিশুখ্রিষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেদিনও উহারা মহুয়াবীজ ভাঙিয়া যেরূপ তৈল বাহির করিত, আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বছর নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অতীতের ঘন কুজ্ঝটিকায়। উহারা আজও সাতনলি ও আঠাকাঠি দিয়া সেইরূপই পাখি শিকার করিতেছে—ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে উহাদের চিন্তাধারা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই।"

অসভ্য জাতির রাজার সঙ্গে কথকের পরিচয় তাই গুরুত্বপূর্ণ—এই পরিচয়ের পটভূমি নিষ্কলঙ্ক শুভ্র নয়, ইতিহাসের জিজ্ঞাসাহীন এক সম্পর্কমাত্র নয়। কথক এক সভ্য 'আর্য' জাতির প্রতিনিধি। দোবরু পান্নার রাজ্যে যার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় সে দোবরু পান্নার বংশধর—তার নাতির মেয়ে, ভানুমতী। ভানুমতীর "লাবণ্য মাখা মুখশ্রী—তবে পরনের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়।" ইতিপূর্বে একদিন এক গ্রামের বৃদ্ধাকে দেখে কথকের মনে হয়েছিল "বন্য সভ্যতার প্রতীক"। আজ এই তরুণীকেও সেই বন্য সভ্যতার বংশধরই মনে হল কথকের। 'আরণ্যক' অবশ্যই সভ্য সমাজ থেকে দূরে অবস্থিত এক মানবগোষ্ঠীর আখ্যান, উপন্যাস, বানানো কাহিনী, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃহত্তর এবং গভীরতর অর্থে 'বাস্তব' কাহিনী। ভানুমতী এক প্রাচীন সভ্যতার বংশধর। সে সভ্যমানুষের পলায়নী প্রয়োজনে নির্মিত যৌনতা-সোচ্চারিত আদিবাসী রমণীর দেহসর্বস্ব সত্তা মাত্র নয়। সে রাজকন্যা ভানুমতী—তার রাজ্য কয়েকটি গ্রামে সীমাবদ্ধ। সে রাজ্যের রাজা "গরু চরাইতেছেন।" রাজ্য-রাজা-রাজকন্যা অরণ্য-আদিম জনজাতি ইত্যাদি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের রোম্যান্টিকতাপূর্ণ সাহিত্যের রমণীয় উপকরণ। দোবরু পান্না-ভানুমতী-কথক সম্পর্ক এই রোম্যান্টিক জগৎকে তীব্রভাবে ধাক্কা দেয় ; অন্তঃশীল পরিহাসে ম্লান হয়ে আসে লুপ্ত রাজবংশের সম্মান ও মর্যাদার কাহিনী। আর ধীরে ধীরে বর্তমান ইতিহাসের স্তর ভেদ করে এক লুপ্ত ইতিহাস আত্মপ্রকাশ করে। দোবরু পান্না কথককে নিয়ে যায় পাহাড়ের ওপর পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থানে। আর এইখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কথক দেখতে পায় "অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ"।

দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মতো অনার্য-আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন....ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থি-কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। ...আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি ; বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই

Scanned with CamScanner

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি —

ক্ষমতা ও আধিপত্যের যে কাঠামোর মধ্যে এক জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে অন্য জনগোষ্ঠীর ধারণা তৈরি হয়, যে মনোভাব থেকে একটা স্থাণু মূর্তি রচিত হয়, তা আজ প্রবলভাবে আহত হল। শুধু বাঙালি-বিহারী নয়, শুধু নাগরিক-আরণ্য নয়, শুধু সভ্য-অসভ্য নয়, সমস্ত 'স্টেরিওটাইপ' চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চায় এই অভিজ্ঞতা। আর সম্ভব নয় 'স্টেরিওটাইপ'-এর নিরাপদ দূরবীক্ষণ দিয়ে জগৎকে দেখা—এইবার উন্মোচিত হয় এক জটিল আত্মজিজ্ঞাসা : 'আত্ম' এবং 'অন্য'-এর সম্পর্ক নিয়ে এক কঠিনতর প্রশ্ন। কথক বুঝতে পারে যে সে এবং 'আরণ্যক'-এর নরনারী এক দেশে থাকে না। 'আরণ্যক'-এর নরনারী তার রচিত 'ভারতবর্ষ'-এর প্রতিবাদ। ভানুমতীর সঙ্গে কথকের শেষ সাক্ষাতে এই সমস্যাটি বিপুল শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। 'ভানুমতীর পৃথিবী কতটুকু' তা জানার উৎসাহে কথক প্রথম প্রশ্নই করেছিল, "ভানুমতী, কখনও কোনো শহর দেখেছ?" ভানুমতী কোনো শহরই দেখেনি। দু-একটা শহরের নাম শুনেছে।

—দু-একটা শহরের নাম বলো তো?

—গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।

—কলকাতার নাম শোনোনি?

—হাঁ বাবুজি।

—কোনদিকে জানো?

—কী জানি বাবুজি।

—আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জানো?

—আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

—ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?

ভানুমতী মাথা নাড়িয়া জানাইল সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চক্‌মকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোনদিকে?

এইভাবে শেষ হয় 'আরণ্যক' উপন্যাস। কুশী নদীর অপর প্রান্তের অরণ্য ভূমির বাকি ইতিহাস অবশ্যই আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। কিন্তু জানি সে ইতিহাস অরণ্যহননের ইতিহাস। সেইসঙ্গে জানি 'আরণ্যক'-এ শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় দুই ভারতবর্ষের কাহিনী। একদল মানুষ, কথক তাদের প্রতিনিধি, গড়ে তুলতে চাইছে এক 'ভারতবর্ষ', আর-একদল মানুষ সেই 'ভারতবর্ষ'-এরই অধিবাসী তারা, তারা জানে না কোথায় সেই ভারতবর্ষ।

Scanned with CamScanner